বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৬ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৫

কর্মক্ষেত্রে শিক্ষিত নারীর অংশগ্রহণ ও নারীর ক্ষমতায়ন: একটি পর্যালোচনা

নুসরাত জাহান পান্না*

১। সূচনা

যেকোনো দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে সেদেশের জনসংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। এ অর্ধেক জনসংখ্যা যদি পশ্চাৎপদ থাকে তাহলে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দেশের নারী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এজন্যই জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) একটি অন্যতম লক্ষ্যমাত্রা হলো জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার উদ্দেশ্যই হলো বিশ্বকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত করার পাশাপাশি সকল ধরনের অসমতা ও বৈষম্য থেকে মুক্ত করা। নিজের অধিকার নিয়ে মানুষ যাতে সুন্দরভাবে, নিরাপদে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে সেজন্য ২০১৬ সাল থেকে ২০৩০ সাল মেয়াদে এসডিজি অর্জনের সময়কাল ধরা হয়েছে। বিশ্বের প্রায় সকল দেশ এই সময়কালে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনে কাজ করে যাবে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে লিঙ্গ সমতার প্রতিচ্ছবি যা একটি দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয়। নারীর ক্ষমতায়নের সাথে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা, অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ ইত্যাদি ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। বর্তমানে এসবক্ষেত্রে নারীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ লক্ষ করা গেলেও তা সন্তোষজনক নয়। বিশেষভাবে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ পুরুষের তুলনায় অতি নগণ্য। এর পেছনে নানা কারণ রয়েছে। বর্তমানে প্রবন্ধে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ। বিশেষ করে শিক্ষিত নারীরা কেন কর্মক্ষেত্রে যেতে অনীহা প্রকাশ করে তার কারণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত, প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের নারী ক্ষমতায়নে শুধু শিক্ষিত নারী নয় বরং শিক্ষিত কর্মজীবী নারীর প্রয়োজন সেই বিষয়টি তুলে ধরা।

এ প্রবন্ধটি মূলত গৌণ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তিশীল। যেমন, একাডেমিক প্রবন্ধ, প্রকাশনা, বই, সরকারি শুমারি ও পত্র-পত্রিকা।

২। নারীর অবস্থান

লিঙ্গ বৈষম্য দীর্ঘকাল ধরে সমাজে বিদ্যমান। ফলে আমাদের সমাজে এর অনেক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নারীরা অবহেলিত হওয়ায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নারীদের অংশগ্রহণ না থাকার কারণে সমাজে নারীরা বরাবরই অবহেলিত ছিল। যেমন: ভোটাধিকার। বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় ভোটাধিকারের মতো

*সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি থেকেও দীর্ঘ সময় নারীদের বঞ্চিত করা হয়েছে। সারণি ১-এ কয়েকটি দেশে নারীদের ভোটাধিকার অর্জনের সময়কাল উল্লেখ করা হল।

সারণি ১ঃ বিভিন্ন দেশে নারীদের ভোটাধিকারের সময়কাল

দেশ	সন
নিউজিল্যান্ড	১৮৯৩
যুক্তরাষ্ট্র	১৯২০
যুক্তরাজ্য	১৯২৮
সুইজারল্যান্ড	১৯৭১
কুয়েত	২০০৫

উৎসঃ Holmes Mary (2009)।

দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের বেশিরভাগ উন্নত দেশে বিংশ শতাব্দির প্রথমদিকে নারীরা ভোটের অধিকার পায়। ভোটাধিকার পাওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীরা অনেক পিছিয়ে। বিভিন্ন দেশের সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলক কম। এ ক্ষেত্রে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো অনেক এগিয়ে। এসব দেশে পার্লামেন্টে নারী সদস্যের হার ৪০ শতাংশের বেশি। এসব দেশ ছাড়া বেশিরভাগ দেশে সংসদে নারী সদস্যের হার ৩০ শতাংশের নিচে। তাছাড়া নারীদের কিছুটা অংশগ্রহণ থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নারীদের উপস্থিতি কম। এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বঞ্চিত হওয়ায় অন্যান্য অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রেও তারা অনেক পিছিয়ে। কিন্তু নারীর ক্ষমতায়নে নারীকে সর্বক্ষেত্রে সুযোগ দিতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মতো নারীর ক্ষমতায়নে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ খুবই প্রয়োজনীয়। সমাজে যথার্থ স্থান অর্জন করতে হলে অবশ্যই সব ধরনের কর্মক্ষেত্রে নারীদের পদচারণা থাকতে হবে। আর এক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে শিক্ষিত কর্মজীবী নারীরা। কিন্তু আমাদের দেশে বেকার শিক্ষিত নারীর সংখ্যা বেশি। তবে কর্মক্ষেত্রে শহরের শিক্ষিত নারীদের চেয়ে গ্রামের অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত নারীদের অংশগ্রহণ বেশি। কর্মক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের নারীদের অংশগ্রহণের হার ৩৭.৬ শতাংশ আর শহরের নারীদের হার ৩০.৮ শতাংশ।

বাংলাদেশে নারী শিক্ষার হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার সর্বপ্রথম দেশ হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা অর্জন করেছে। এমনকি মাধ্যমিক শিক্ষায়ও আমাদের এই সাফল্য রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৮ মিলিয়ন। এদের মধ্যে ৯৭.৯ শতাংশ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে, যাদের ৫০.৯ শতাংশ আবার মেয়ে শিক্ষার্থী। আর মাধ্যমিক শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ হার ৫৩ শতাংশ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে তাকালেও দেখা যায় মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা উন্নতির দিকে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ২০০৯ সাল থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। ২০১৬ সালে দেশের মোট শিক্ষার্থীর ৩৫.২৭ শতাংশ ছিল মেয়ে শিক্ষার্থী। দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের মেয়েদের অবস্থান সন্তোষজনক।

কিন্তু নারীর ক্ষমতায়ন আনয়নের জন্য শুধু শিক্ষার হার বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও যদি নারী কর্মজীবনে অর্থাৎ চাকরিতে প্রবেশ না করে তাহলে সমাজে তার অবস্থার উন্নতি হবে না। পরিবার, সমাজ তথা দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণের জন্য নারীকে শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি উপার্জনক্ষম হতে হবে। তাহলেই সে অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারবে। ইউএনডিপি মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৮ অনুযায়ী, বাংলাদেশে নারীরা পুরুষের তুলনায় বেশ পিছিয়ে রয়েছে। পুরুষেরা নারীদের চেয়ে আড়াই গুণ বেশি আয় করতে পারেন। নারীদের মাথাপিছু গড় আয় যেখানে (পিপিপি অনুসারে) মাত্র ২ হাজার ৪১ ডলার, সেখানে পুরুষের গড় আয় ৫ হাজার ২৮৫ ডলার।

শুধু শিক্ষিত হলেই যে নারী লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হবে না তেমনটি নয়। আমাদের সমাজে এখনও পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকেই মর্যাদা দেয়ার মানসিকতা প্রচলিত রয়েছে। তাই সমাজে অবদান রাখতে হলে নারীদের অবশ্যই তার শিক্ষাকে কাজে লাগাতে হবে। নারীর ক্ষমতায়ন তখনই হবে যখন নারীরা অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে কর্মক্ষেত্রের সর্বত্র অবাধ বিচরণ করবে এবং এর মাধ্যমে সার্বিক অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। কর্মক্ষেত্রে মেধার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষিত নারী দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে। তাই দেশের টেকসই উন্নয়নে যে হারে শিক্ষিত নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে কর্মজীবী নারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে হবে। আমাদের দেশে কর্মক্ষেত্রে শিক্ষিত নারীর অংশগ্রহণ কম হওয়ার পেছনে কিছু কারণ রয়েছে।

৩। কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণে অনীহার কারণ

নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নের জন্য দুটো শর্ত অবশ্য পূরণীয়। একটি হচ্ছে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন আর অন্যটি হচ্ছে নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ন। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে জরুরি বিষয়গুলো হচ্ছে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কারিগরি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উত্তরাধিকার, সম্পদ, উপার্জনের সুযোগ ইত্যাদি। আমাদের দেশের নারীরা এখনও এসব ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে। ফলে নারীদের কর্মক্ষেত্রে গমনে রয়েছে অনীহা। বিভিন্ন কারণে তাদের এই অনীহার সৃষ্টি হয়।

৩.১। প্রযুক্তিগত শিক্ষার অভাব

কর্মক্ষেত্রে নারীদের পিছিয়ে থাকার একটি অন্যতম মূল কারণ হলো প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় নারীর কম উপস্থিতি। এর পেছনে বেশ কিছু কারণও রয়েছে। যেমন: আমাদের সমাজে এখনও এমন অনেক পরিবার রয়েছে যেসব পরিবারের অভিভাবকেরা ছেলেদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে যে ব্যয় করেন মেয়েদের ক্ষেত্রে সে পরিমাণ ব্যয় করতে নারাজ। বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিভিত্তিক পড়াশোনায় ব্যয় তুলণামূলক বেশি তাই অভিভাবকেরা চান মেয়েরা বিজ্ঞানে না পড়ে মানবিক বিষয়গুলোতে পড়বে। আর ছেলেরা প্রকৌশল বা প্রযুক্তিগত শিক্ষা গ্রহণ করবে। এই মানসিকতার ফলে মেয়েরা প্রযুক্তিতে তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলস্বরূপ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের উপস্থিতি বেশি।

চিত্র ১: লিঙ্গ ভেদে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা

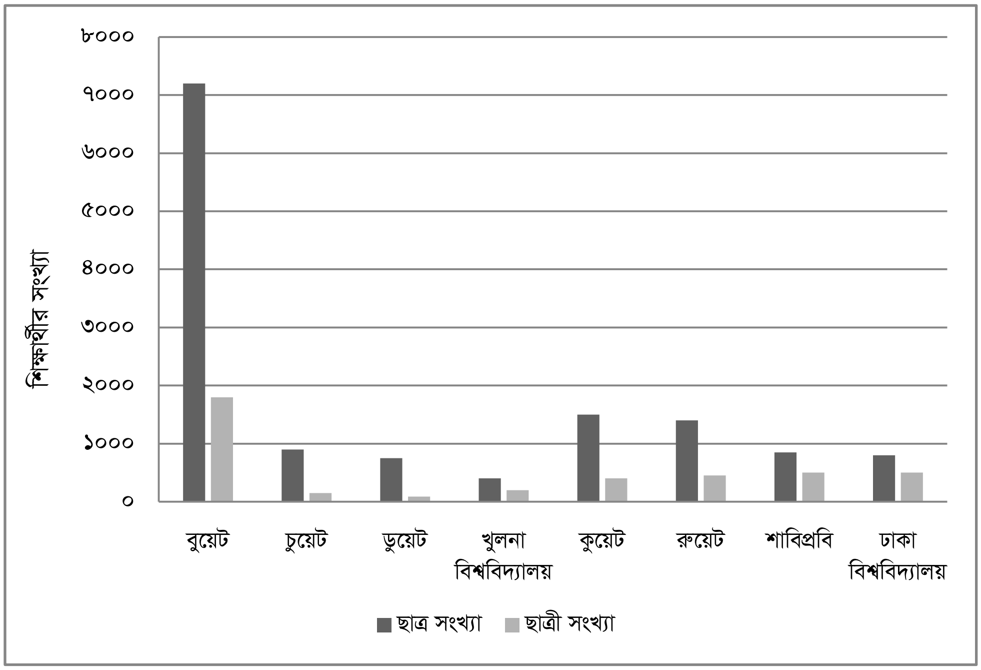

উৎস: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বার্ষিক রিপোর্ট, ২০১৪।

প্রযুক্তিগত শিক্ষায় মেয়েরা কতোটা পিছিয়ে তা চিত্র ১ থেকে সুস্পষ্ট। আর তাই কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের অনেক পিছিয়ে থাকতে হয়। প্রযুক্তিগত কর্মক্ষেত্রে ছেলেদের উপস্থিতি মেয়েদের কয়েকগুণ বেশি। এক জরিপে দেখা গেছে, টেকনিক্যাল পেশায় নিয়োজিত ১,৪৬৯ জনের মধ্যে ১,১২৯ জনই পুরুষ আর নারী মাত্র ২৪০ জন। নারীদের তাই কারিগরি শিক্ষায় আগ্রহী করে তুলতে হবে আর তাহলেই তাদের জন্য প্রসারিত কর্মক্ষেত্র থাকবে। অনেক সময় নারীরা প্রযুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী নয় বলে নিয়োগকারীরা তাদের নিয়োগে আগ্রহী হয় না। তাই শুধু শিক্ষিত হলেই হবে না নিজেকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রযুক্তির ব্যবহার জানতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা অনেকটা দায়ী। কারণ অনেক সময় দেখা যায় পরিবারে একটি কম্পিউটার কেনার সামর্থ্য থাকলে তা পরিবারের পুরুষ সদস্যের জন্যই কেনা হয়। এমন অনেক বিষয় নারীদের এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাই মেধা বিকাশে নারী পুরুষ উভয়কেই তাদের যথাযথ ও প্রাপ্য অধিকার দিতে হবে। তাহলেই নিজের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ থাকে।

৩.২। নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রের প্রতি আগ্রহ

নারীরা নির্দিষ্ট কিছু কর্মক্ষেত্রকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে বলে তাদের কাজের জায়গাগুলো আরও সংকীর্ণ হয়ে যায়। কাজের ক্ষেত্রে তারা কাজের ধরন, কাজের পরিবেশ ও কাজের স্থান বা দূরত্বকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যেমন: বেসরকারি চাকরির চেয়ে সরকারি চাকরিতে নারীদের আগ্রহ বেশি।

আবার কিছু কিছু পেশা রয়েছে যেগুলো নারীদের পছন্দের শীর্ষে যেমনঃ শিক্ষকতা। নারীরা চ্যালেঞ্জিং পেশায় যেতে চায় না। পছন্দের পেশায় সুযোগ না হলে অনেক সময় তারা বেকার থেকে যায়। শিক্ষিত নারীদের তাদের চিন্তাকে প্রসারিত করে সব ধরনের পেশার জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে। সরকারি চাকরিতে নারীদের আগ্রহের বিষয়টি বিসিএস এর পরীক্ষার ফলাফল থেকে অনেকটা পরিলক্ষিত হয়।

সারণি ২: বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল

বিসিএস পরীক্ষার নাম	পুরুষ	মহিলা	মোট
৩১তম	১,৪৭৫ (৭০.৩৭%)	৬২১ (২৯.৬২%)	২,০৯৬ (১০০%)
৩২তম	৭৫২ (৪৪.৯০%)	৯২৩ (৫৫.১০%)	১,৬৭৫ (১০০%)
৩৩তম	৫,২৫২ (৬১.৭৪%)	৩,২৫৫ (৩৮.২৬%)	৮,৫০৭ (১০০%)
৩৪তম	১,৪০০ (৬৪.৩৭%)	৭৭৫ (৩৫.৬৩%)	২,১৭৫ (১০০%)
৩৫তম	১,৫৬৫ (৭২.০৫%)	৬০৭ (২৭.৯৫%)	২,১৭২ (১০০%)

উৎস: বার্ষিক প্রতিবেদন, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, ২০১৬।

সারণি ২ থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, অন্যান্য অনেক চাকরির চেয়ে বিসিএসে নারীদের উপস্থিতি বেশি। এক্ষেত্রে আবার অন্যান্য ক্যাডারের চেয়ে শিক্ষা ক্যাডারে নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলক বেশি। যেমনঃ বিগত ৩৫তম বিসিএসে ১২০ জনকে পুলিশ ক্যাডারে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ১৮ জন মেয়ে। কিন্তু একই বিসিএসে শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত ৮৬৫ জনের মধ্যে ২৩৩ জন নারী, যা প্রায় এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি। অর্থাৎ শিক্ষা ক্যাডারে নারী উপস্থিতি তুলনামুলক বেশি । কারণ নারীদের পছন্দের তালিকায় শিক্ষকতা প্রাধান্য পেলেও পুলিশের মতো চ্যালেঞ্জিং পেশা থাকে না।

৩.৩। কর্মক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা

মাতৃত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নারীদের উপর ন্যস্ত থাকায় নারীরা পরিবার ও কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারে না। ফলে অনেক কর্মজীবী নারীকে সন্তান জন্মের পর কর্মজীবন ত্যাগ করতে হয়। এমনকি উচ্চ পর্যায়ের পেশায় নিয়োজিত নারীরাও অনেক সময় চাকরি ছেড়ে দেয় সন্তান জন্মদানের পর। এক্ষেত্রে কর্মস্থানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কর্মস্থল অনেক সময় নারীদের এই উভয় দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করে না। ফলে নারীদের বাধ্য হয়ে কর্মক্ষেত্র ও মাতৃত্ব এ দুটোর যেকোনো একটিকে বেছে নেয়ার মতো পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এক্ষেত্রে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাও অনেকটা দায়ী। কারণ পরিবার ও সমাজ অনেক সময় নারীদের এসব ক্ষেত্রে পিছিয়ে রাখে। কর্মক্ষেত্রে সময় দেয়ার ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের সমান সুযোগ পায় না বলে তারা দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে ওঠে না।

আবার পরিবারের সদস্যরাও অনেক ক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়ায় না। সন্তানকে রেখে মা কর্মস্থলে বেশি সময় দিবে তা পরিবার মেনে নিতে চায় না। তাই কর্মক্ষেত্রগুলোও নারী কর্মী নিয়োগে ততোটা আগ্রহী থাকে না। ফলে উচ্চ পর্যায়ে নারীদের উপস্থিতি কম।

কর্মক্ষেত্রের কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যার ফলে কর্মজীবী নারীরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। এক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে। এমনকি নারীদের বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হতেও দেখা যায়। কর্মক্ষেত্রের এসব সমস্যার কারণে নারীরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও অনেক সময় কর্মজীবনে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক থাকে না। কিছু পেশা রয়েছে যেখানে নারীদের শারিরীক ও মানসিক উৎপীড়নের শিকার হতে হয়। এই নেতিবাচক প্রভাবের কারণে নারীদের কর্ম সন্তুষ্টি হ্রাস পায়, সহকর্মীদের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটে, এমনকি চাকরী হারানোর মতো ঘটনাও ঘটে থাকে। নারীদের কর্মমুখী করতে তাই কর্মক্ষেত্রগুলোর দায়িত্ব রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে যথাযথ মর্যাদা পেলে নারীরাও কর্মমুখী হতো। নারীদের যেহেতু একই সাথে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে হয় (যেমনঃ কর্মী, স্ত্রী এবং মায়ের ভূমিকা) সেহেতু কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধারও প্রয়োজন রয়েছে। নারী যখন এসব দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তুলনামুলক কম বাধার বা সংঘাতের সম্মুখীন হবে তখনই সে পারিবারিক এসব দায়িত্বের পাশাপাশি কর্মজীবনকেও গুরুত্ব দেবে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সমস্যা থাকলে এর বিপরীত ঘটবে।

আমাদের দেশে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যেমনঃ যানবাহনের অভাব, শৌচাগারের অভাব, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রের অভাব সর্বোপরি নিরাপত্তার অভাব। কিছু বেসরকারি চাকরি রয়েছে যেখানে নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়সীমা কম। এছাড়াও অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হয়। এসব নানা কারণে নারীরা কর্মক্ষেত্রের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। সঠিক প্রক্রিয়া, পরিবেশ ও কর্মক্ষেত্রের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা যায়।

৩.৪। বিভিন্ন সামাজিক কারণ

কিছু সামাজিক কারণ আমাদের সমাজে বিদ্যমান রয়েছে যেগুলো নারীদের কর্মজীবী হিসেবে গড়ে উঠতে বাধার সৃষ্টি করে। যেমনঃ পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব,বাল্যবিবাহ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের প্রাধান্য না দেয়া ইত্যাদি। আমাদের সমাজে এখনও দেখা যায় বাবা-মা ছেলে সন্তানকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ছেলেকেই তারা বৃদ্ধ বয়সের আশ্রয়স্থল মনে করে বলে পরিবারের পুরুষ সদস্যরাই পড়ালেখা করে চাকরি করবে এমন মনোভাব রয়েছে। তাই মেয়েদের পড়াশোনার প্রতি অনেক পিতা-মাতা যত্নশীল হন না। যদিও কিছুটা পড়াশোনা মেয়েদের করানো হয় তবে চাকরি করার ক্ষেত্রে পরিবারের সম্মতি থাকে না। এক্ষেত্রে সামাজিক, ধর্মীয় নানা কারণকে তারা প্রাধান্য দেন এবং নারীকে অনগ্রসর করে রাখেন।

বাল্যবিবাহ নারীদের পশ্চাৎপদের অন্যতম কারণ। আমাদের সমাজে এখনও বাল্যবিবাহ প্রচলিত রয়েছে। UNICEF এর ২০১৫ সালের এক প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশ বিশ্বের ৪র্থ বৃহত্তম

বাল্যবিবাহের দেশ। এখানে ১৫ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিয়ের হার ২৯ শতাংশ এবং ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিয়ের হার ৬৫ শতাংশ। অল্পবয়সে বিয়ের কারণে বিপুল সংখ্যক মেয়ে পড়ালেখা থেকে ঝড়ে যাচ্ছে। মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেয়ার ফলে যেমন অনেক সময় তাদের পড়ালেখা করার সুযোগ হয় না তেমনি তারা অন্যের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়। বর্তমান সময়ে বিয়ের পর অনেকে পড়ালেখা করার অনুমতি পেলেও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের অনুমতি পায় না। অল্প বয়সে বিয়ের কারণে তারা দৃঢ়ভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ফলে শিক্ষিত হয়েও অনেক নারী বেকার জীবনযাপন করে।

আবার অনেক সময় দেখা যায় নারীরা চাকরিজীবী হলে তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ায় পরিবারে তাদের কর্তৃত্ব বেড়ে যাবে এমন অনেক পুরুষতান্ত্রিক চিন্তার ফলে নারীদের চাকরি করতে দেয়া হয় না। অনেক নারী রয়েছে যাদের নির্ভরশীল মানসিকতা রয়েছে। অর্থাৎ তারা শিক্ষিত হয়েও পুরুষের উপর নির্ভরশীল থাকতে পছন্দ করে। গৃহস্থালীর কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখতে যেয়ে নিজের পেশাগত দিককে অবহেলা করে। অন্যের উপর অর্থনৈতিক নির্ভরতা এক সময় তাদের দুর্বল ও কোণঠাসা করে রাখে। সামাজিক ক্ষমতার দিক থেকে তাদের অবস্থান হয় পুরুষের অনেক নিচে। পরিবারের কোনো ব্যাপারে তাদের একক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা থাকে না। এদের জীবনে থাকে নিরাপত্তার অভাবের পাশাপাশি অর্থনৈতিক নিশ্চয়তার অভাব। এর ফলেই তারা বৈষম্যের শিকার হয়। অন্যদিকে একজন শিক্ষিত কর্মজীবী মায়ের সন্তানেরা অনেকটা স্বাবলম্বী মনোভাব নিয়ে বেড়ে ওঠে। শিশুরা ছোটবেলা থেকেই মাকে স্বাবলম্বী হিসাবে দেখে বলে তাদের মধ্যে একই মনোভাব গড়ে ওঠে। একজন গৃহিণী মাকে শিশু ছোটবেলা থেকেই দেখে সে শুধু গৃহস্থালীর কাজ করে এবং পরিবারে তার কোনো অর্থনৈতিক প্রভাব বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেই। ফলে শিশুর মনে এই ধারণাই কাজ করে যে মা অন্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু মা যদি কর্মজীবী হয় তাহলে শিশু ছোটবেলা থেকে এভাবেই চিন্তা করে যে সেও বড় হয়ে অন্যের মুখাপেক্ষী হবে না। তার কাছে তখন পরিবারের লিঙ্গ বৈষম্য প্রতীয়মান হয় না। ফলে বড় হয়ে সেও লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তুলবে, যা একটা সমাজের উন্নয়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪। নারীদের কর্মক্ষেত্রে আগ্রহী করার উপায়

নানা প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের নারীরা বর্তমানে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছে। নিজের ও পরিবারের অর্থনৈতিক নির্ভরতার জন্য বিভিন্ন পেশায় নারীরা নিজেদের নিয়োজিত করছে। ফলে এখন দেশে প্রতিবছর কর্মজীবী নারীর সংখ্যা শতকরা ৪.৪ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা এখন নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন। তাই অনেক সময় শুধু অর্থনৈতিক কারণে না হলেও নিজেকে পেশার দিক দিয়ে মর্যাদা প্রদান করতেও তারা কর্মক্ষেত্রে অবদান রাখছে।

তড়িৎ ও ইলেকট্রনিকস প্রকৌশলীদের আন্তর্জাতিক সংগঠন আইইইইআর-এর (IEEER) ‘উইম্যান ইন ইঞ্জিনিয়ারিং’ বাংলাদেশ শাখা সম্প্রতিকালে ঢাকায় এক সম্মেলনের আয়োজন করে। উক্ত সম্মেলনে বিজ্ঞান, গণিত ও প্রকৌশলে মেয়েদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সফলতার কথা বলা হয়। সঠিক ও

অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে নারীরাও এসব বিষয়ে পুরুষদের ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়। নারীর ক্ষমতায়নের জন্যই তাদের বেশি সংখ্যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যোগ দেয়া উচিত। বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেকে তৈরি করতে তাই নারীদের এসব বিষয়ে পারদর্শী করে তুলতে হবে। তাহলেই কর্মক্ষেত্রে তাদের চাহিদা যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি তাদের অংশগ্রহণও বৃদ্ধি পাবে।

পছন্দের নির্দিষ্ট পেশার ধারণা থেকে নারীরা এখন অনেকটাই সরে এসেছে। সব ধরনের চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারীদের উপস্থিতি এখন দেখা যাচ্ছে। নারীরা এখন শুধু সরকারি চাকরিতে নয় অধিকন্তু বিভিন্ন বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানেও কাজ করছে। অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সরকারি চাকরির ন্যায় অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ফলে মেয়েরা এখন বেসরকারি চাকরির দিকেও আগ্রহ প্রকাশ করছে। নারীদের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে নারী কর্মী নিয়োগ করছে অনেক প্রতিষ্ঠান। তাই শ্রমশক্তিতে নারী অংশগ্রহণের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯০ সাল থেকে ২০১০ সাল এই বিশ বছরে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে নারীদের আগ্রহী করতে হলে কিছু সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। যেহেতু একজন নারীকে মাতৃত্ব ও চাকরী দুই দিক সামলাতে হয় তাই তাকে এই সুযোগগুলো দিতে হবে। যেমন: সরকারি ও বেসরকারি উভয় চাকরিতে শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রের সুব্যবস্থা থাকতে হবে। কারণ সন্তানকে রেখে মাকে দীর্ঘ সময় কর্মক্ষেত্রে থাকতে হলে অনেক সময় কাজে মনোযোগ থাকে না। তাই তাকে কাজের প্রতি মনোযোগী করতে এ ব্যবস্থা থাকা জরুরি। এছাড়াও কর্মক্ষেত্র থেকে যানবাহনের ব্যবস্থা করা হলে নারীদের গণপরিবহনে যাতায়াত করতে হবে না বিধায় নারীরা কর্মমুখী হবে। কর্মক্ষেত্রে যেন নারীরা কোনো প্রকার হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে প্রতিষ্ঠানগুলোকে সচেতন হতে হবে। এসবক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

এক্ষেত্রে পরিবারেরও ভূমিকা রয়েছে। নারীদের কর্মক্ষেত্রের প্রতি আগ্রহী করার প্রধান দায়িত্ব তার পরিবারের। পরিবার যদি সর্বোচ্চ সহযোগিতা করে তবে নারীরা পিছিয়ে পড়বে না। সমাজ থেকে সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে নারীদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বাল্যবিবাহ রোধের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা যায়। বর্তমানে আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ রোধে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সভা, সেমিনারের আয়োজন করেন। ফলে অনেক এলাকায় বাল্যবিবাহ হ্রাস পাচ্ছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের ৬৪টি জেলাসহ বিভিন্ন উপজেলায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত মনিটরিং চলমান রেখেছে। ২০১৫ হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ২,৭৬৩ জন শিশু বাল্যবিবাহ হতে পরিত্রাণ পেয়েছে। প্রতি বছর ২৯ সেপ্টেম্বর বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশে বাল্যবিবাহের হার হ্রাস করতে পারলে মেয়েরা পড়ালেখা করে নিজের সিদ্ধান্ত নিজে গ্রহণ করতে পারবে।

৫। সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সবক্ষেত্রে নারীদের জন্য সবধরনের সুযোগ-সুবিধার দিকে সরকারের নজর রয়েছে। ২০১৫ সালে প্রকাশিত বৈশ্বিক লিঙ্গ বিভাজন সূচক (গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স) প্রতিবেদন অনুযায়ী নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৬ষ্ঠ। দেশে লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং সেসব পদক্ষেপ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়নে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন অর্জনের মধ্যে রয়েছে :

- জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৪৫টি থেকে বৃদ্ধি করে ৫০টিতে উন্নীত করা হয়েছে।
- জাতীয় সংসদে প্রথমবারের মতো নারী স্পিকার নিয়োগ করা হয়েছে।
- উপজেলা পরিষদে ১টি করে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।
- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে একজন নারী অধ্যাপককে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- সেনাবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ে নারীদের নিয়োগ করা হয়েছে।
- প্রশাসনিক বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ে এখন নারীদের উপস্থিতি লক্ষণীয়।
- সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে ও হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতিসহ, জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার পদে নারীরা নিয়োগ পাচ্ছে।

এছাড়াও ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে নারীদের জন্য ১ লক্ষ ১২ হাজার ১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা মোট বাজেটের ২৭.৯৯ শতাংশ।

আমাদের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদেও নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।" ২৮(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।" ২৮(২) অনুচ্ছেদে আছে, "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।" ২৯(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।"২৯(২) এ আছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মের নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।"

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ লক্ষ করলে দেখা যায় এতে নারীদের জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক, শিক্ষাগত, পেশাগত, আইনগত, স্বাস্থ্যগত ইত্যাদি বিভিন্ন অধিকার বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। এসব বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হলে নারীর ক্ষমতায়ন হবে।

৬। সুপারিশমালা

নারীর ক্ষমতায়নে কর্মক্ষেত্রে শিক্ষিত নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। সে কারণে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নারীদের কর্মক্ষেত্রে আগ্রহী হওয়ার প্রতি যত্নশীল হতে হবে ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- সংবিধান ও নারী উন্নয়ন নীতি অনুযায়ী নারীদের যেসব অধিকার রয়েছে সেগুলো যেন অর্জিত হয় সে ব্যাপারে সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।
- জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। বাজেট বরাদ্দ যথাযথ খাতে ব্যয় হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে নজরদারি থাকতে হবে।
- নারীদের কর্মক্ষেত্রে গমনে যেসব সামাজিক বাধা রয়েছে সেসব দূরীকরণের নিমিত্ত সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।
- নারীদের কর্মক্ষেত্রে আগ্রহী করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। যেমন: সন্তোষজনক বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি।

৭। উপসংহার

নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষিত নারীকে অবশ্যই অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে। এজন্য কর্মক্ষেত্রে গমন আবশ্যক। শিক্ষিত নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি নয় বরং শিক্ষিত কর্মজীবী নারীর সংখ্যা বৃদ্ধিই পারে নারীকে তার যথার্থ মর্যাদা প্রদান করতে। এক্ষেত্রে যে বাধার সম্মুখীন হতে হয় তা তাকে অতিক্রম করতে হবে। এজন্য সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। সমাজ থেকে বিভিন্ন কুসংস্কার দূর করে সমাজের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। দেশকে এগিয়ে নিতে নারীকে পুরুষের সমান দায়িত্ব পালনে সহায়তা করতে হবে। সরকারি পদক্ষেপ, কর্মক্ষেত্রগুলোর পদক্ষেপ, পরিবারের পদক্ষেপ সর্বোপরি নারীর অদম্য ইচ্ছাই পারে নারীদের কর্মমুখী করতে।

গ্রন্থপঞ্জি

আইয়ুব, মিয়া মুহাম্মদ ও আবুল কাসেম হায়দার (২০০৮), *বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় নীতিমালা*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ২৬৮।

খানম, রাশিদা আখতার (২০১১): *নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৬, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ.৭২,৭৯,৮০।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি*-২০১১, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ.৪,৫।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়,বর্তমান সরকারের সাড়ে আট বছরের সাফল্য চিত্র (জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

Holmes Mary (2009): *What Is Gender? Sociological Approches*, SAGE Publications Ltd., pp. 10-11.